সিজোফ্রেনিয়াঃ মুক্তি বহুমূখী চিকিৎসায়

সিজোফ্রেনিয়াকে একসময় বলা হতো সাইকিয়াট্রির ক্যান্সার। বলা হতো- এটি আর ভাল হয়না এমন বিশ্বাস এখনো বহুল প্রচলিত। যার সিজোফ্রেনিয়া হয় তার আচার-আচরণ হয় অদ্ভূত। সে এমন সব আচরণ করে যা কল্পনাও করা যায়না। একজন রোগীকে একবার খুজে পাওয়া যাচ্ছিলনা। অনেক ডাকা ডাকির পর তাল গাছের উপর থেকে তার সাড়া মিললো। ব্যাপার এই- গরম লাগছিল। গ্রামের বাড়ি। বিদ্যুৎ নেই। তাই তাল গাছের মাথায়। বেশ বাতাস লাগছিল। রাত্রি বারটার উপর। গ্রামের বাড়ি। সবাই খুব ভয় পেয়ে গেল। এক রোগীকে একবার দেখলাম মহা আনন্দে ড্রেনের পানি পান করছিল। তার চোখ-মুখের ভাব দেখে বুঝলাম সে হয়তো ড্রেনটাকে ঝরনা বা এধরণের কোন পানির উৎস ভেবেছে। এক রোগীকে আত্মীয়-স্বজন একটা বিবাহই দিয়ে দিল। বউ এসে রোগীর দেখা শোনা করবে। সকালে ওকে আর খুজে পাওয়া যাচ্ছিলনা। কি বিষয়? পরে পাওয়া গেল মাচার উপর। রোগীর সাফ উত্তর। অনেক দিন মাটির উপর হাটাহাটি করেছি। এখন ধরনা, মাচা এগুলোতে কিছু দিন থেকে দেখি কি হয়। সিজোফ্রেনিক রোগীর মেজাজ-মর্জি অনেক সময় বেশ খারাপ থাকে। খামোখাই খেপে যায়। আসলে রোগীর মাথা বোঝাই থাকে নানা ধরণের ভুল ধারণা। একজন রোগীর ধারণা কেউ যদি পায়ের উপর পা তুলে বসে পা দোলায় তার মানে সে রোগীকে খারাপ ইঙ্গিত দিচ্ছে। তার সাথে খারাপ কাজ করতে চাচ্ছে। কত্ত বড় আস্পর্ধা! তাকে গিয়ে সোজা মার শুরু করে দিল। আরেক রোগী বিশ্বাস করতো যে তার পিছনে পুলিশ লেগে গেছে। তার প্রেমিকা তার পিছনে পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছে। ভয়ে সে আর বাঁচেনা। এক জায়গায় দুই রাত্রি থাকার সাহসও তার নেই। কতদিন আর ফেরারী হয়ে থাকা যায়? কি কষ্ট! পুলিশের সার্জেন্ট হয়তো ওয়্যারলেসে কারো সাথে কথা বলতে বলতে হাঁটছেন। এটার মানে তিনি এই রোগীর বিষয়ে কাউকে নির্দেশনা দিচ্ছেন। অনেক সময় রোগীর ভাষায় গোলমাল লাগে। তার কথাবার্তা পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়না। অনেক রোগী নিজের যত্ন নিজে নিতে পারেনা। বার বার না বললে নিজের নখ কাটেনা, দাঁত মাজেনা, গোসল করেনা। সারা গায়ে দূর্গন্ধ। এক জায়গায় চুপ-চাপ বসে বা শুয়ে থাকে। কথাও বলেনা। কোন কাজ করেনা। চাকুরী করেনা, লেখাপড়া করেনা। একা একা কথা বলে। বিড় বিড় করতেই থাকে। যেন কারো কথা শুনতে পাচ্ছে। তার কথার উত্তর দেয়। কিন্তু অন্য কেউ তার কথা শুনছেও না, কিছু দেখছেও না। রোগী নিজেই একা একা শুনে। কোন কারণ ছাড়াই রোগী তার স্বামী বা স্ত্রীর চরিত্র নিয়ে গুরুতর সন্দেহ করে ও সাংঘাতিক ভাবে তদন্ত শুরু করে। ধরে মারপিটও করে। আসলে কিন্তু কিছুইনা। রোগী বলে তার খাবারে বিষ বা খারাপ কিছু মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে খায়না। না খেয়ে না খেয়ে তার শরীর দড়ির মতো হয়ে যায়। এক রোগী দীর্ঘদিন না খেয়ে শেষে অপুষ্টিতে মরেই গেল। একজন নিজেকে সৃষ্টিকর্তার দূত মনে করতো। আরেকজন বিশ্বাস করতো আসলে তার বাবার

রূপ ধরে শয়তান ঘোরাফেরা করছে। তাই সে একদিন বাবাকে কুপিয়ে মেরেও ফেললো। পুলিশ এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল। কত বিচিত্র লক্ষণ হতে পারে সিজোফ্রেনিয়ার- তা বলে আর শেষ করা যায়না। তবে সবার মধ্যে সব লক্ষণ কিন্তু থাকেনা। মানসিক রোগের ডাক্তার বা সাইকিয়াট্রিষ্টরা সিজোফ্রেনিয়ার রোগ নির্ণয় করে থাকেন।

বাংলাদেশে কি সিজোফ্রেনিয়ার রোগী আছে? উত্তর হলো আছে। দেশব্যাপী পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় যে, দেশে শতকরা ০.৬ ভাগ পূর্ণবয়সী মানুষের মধ্যে সিজোফ্রেনিয়া বা এধরণের গুরুতর মানসিক রোগ আছে। যদি ষোল কোটী মানুষের মধ্যেই এই হারে এই রোগ আছে ধরে নিয়ে হিসাব করি তবে দেশে মোটামুটি ভাবে ষোল লাখ ষাট হাজার সিজোফ্রেনিয়ার রোগী আছে। এই সংখ্যা কিন্তু অবহেলা করার মতো নয়।

বাংলাদেশে সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসার পুরো বিষয়টা খুব ভাল ভাবে পরিচালিত হচ্ছেনা। যতটুকু চিৎসা আছে তা শুধু ঔষধের প্রয়োগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাও সবাই চিকিৎসা পাচ্ছেনা। অনেকে চিকিৎসা নিতেও আগ্রহী নয়। অনেকে জানেইনা। এখনো কবিরাজ-পীর-ফকিরের, তাবিজ-কবোজ ও ওঝার খপ্পর থেকে এই চিকিৎসা ডাক্তারের হাতেই আসেনি ঠিকমতো। অনেকে বোঝেইনা যে এটি একটি রোগ। অনেকে জানেনা কোথায় চিকিৎসা পাওয়া যায়। মানসিক রোগের যে ডাক্তার আছে, তাদের যে সাইকিয়াট্রিষ্ট বলে তাই জানা নেই বেশীর ভাগ মানুষের। যারা জানে তারাও ভুল ভাবে জানে। ভাবে সাইকিয়াট্রিষ্টের ঔষধ খেলে মানুষ আরো পাগল হয়ে যাবে। ফল হলো সিজোফ্রেনিক রোগীর সাংঘাতিক দূর্ভোগ। তারা মার খায়, নির্যাতিত হয়। তাদেও বিনা চিকিৎসায় শিকল দিয়ে বেধে রাখা হয় পশুর মতো। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। চিকিৎসা আছে, কিন্তু জ্ঞান নেই।

বাংলাদেশে মানসিক রোগের ডাক্তারেরা অ্যান্টিসাইকোটিক ঔষধ ব্যবহার করে সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। মুস্কিল হলো এই ঔষধগুলোর অনেক ধরণের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকে। রোগী চোখে ঝাপসা দেখে, তার শরীর কাঁপে, তার গলা শুকিয়ে আসে, পায়খানা কশা হয়ে যায়, অনেকে মোটা হয়ে যায়। কারো কারো সারাক্ষণ নেশাখোরের মতো ঘুম ঘুম লাগে। তাই রোগীরা এই ঔষধগুলো খেতে চায়না। প্রায়ই ছেড়ে দেয়। এছাড়া ঔষধ যে দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যেতে হবে তা রোগী বা তার পরিবার বুঝতেও পারেনা, মনে হয় বুঝতে চায়ও না। ঔষধ খাব, রোগ ভাল হয়ে যাবে। সর্বোচ্চ দুই এক সপ্তাহ ঔষধ খাব। তার বেশী আর কি দরকার- এমনটা চিন্তা। এছাড়া মানুষ গরীব। এই রোগের ঔষধ বেশ ব্যয়স্বাপেক্ষ। কেউ ঔষধ খেতে দেখে বুঝে ফেললে আর রক্ষা নেই। নির্ঘাত পাগল বলে কটাক্ষ করবে। সিজোফ্রেনিয়া হলে রোগী বুঝতে পারেনা যে তার কোন রোগ হয়েছে। তার লক্ষণগুলোকে সে বাস্তব মনে করে। এক রোগী অভিভবাকদের আউটডোরের ডাক্তারের চেম্বারের বাইরে রেখে ডাক্তারকে একান্তে জানালো যে আসল পাগল হলো তার বাবা-মা। সে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এসেছে। এখন ডাক্তার সাহেব একটু কড়া ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা দিলেই হয়। পারলে

একদম ভর্তি করিয়ে দিক। আরেক রোগী তার ঔষধ নিজে না খেয়ে জোড় করে তার মাকে খাইয়ে তাকে হাসপাতালের বেডে রেখে সোজা চম্পট দিল। রোগীরা নিজেদের পুরোপুরি সুস্থ ভাবে। এরকম জ্ঞান থাকলে রোগী ঔষধ খেতে চাইবার কথা নয়। তারা খেতে চায়ও না। সব মিলিয়ে ঔষধ নিয়মিত খাওয়া হয়না। ফলে বার বার অসুখের লক্ষণ বেড়ে গিয়ে মহা অশান্তি হয়।

ভাল ভাবে ঔষধ ব্যবহার করলে ও অন্যান্য চিকিৎসা নিলে কিন্তু সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণগুলো অনেক কমে যায়। গবেষণায় দেখা যায় যে, শতকরা এক তৃতীয়াংশ রোগী ঔষধের মাধ্যমে একদম ভাল হয়ে যায়। বাকি এক তৃতীয়াংশ ঔষধ সহ ভাল থাকে। স্বাভাবিক জীবন-যাপন চালিয়ে নিতে পারে। বাকি এক তৃতীয়াংশের অসুখ ততটা ভাল হয়না।

সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসায় উন্নত বিশ্বে ঔষধের পাশাপাশি আরো নানা প্রকার চিকিৎসা ব্যবহৃত হচ্ছে। মানসিক রোগীরা দিনের পর দিন কোন কাজ করেনা। তাদের নিজের যত্ন নেবার ক্ষমতা নেই। তারা চিত্তবিনোদন করেনা। তারা সারা দিনে সময় কাটানোর কিছু পায়না। কিছুই করেনা। ফলে তৈরী হয় ডিজঅ্যাবিলিটি। সে কিছু করতে ভুলে যায়। সিজোফ্রেনিয়া অল্প বয়সে হলে ক্ষতি হয় সবথেকে বেশী। রোগীরা কোন পেশায় কাজ করতে পারেনা। অকুপেশনাল থেরপিষ্ট বলে একধরণের পেশাজীবী আছেন যারা এক্ষেত্রে রোগীদের সাহায্য করতে পারেন। বাংলাদেশে সাভারের চাপাইনে সিআরপি বলে একটি প্রতিষ্ঠান হতে অকুপেশনাল থেরাপির উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। অকুপেশনাল থেরাপিষ্টরা সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। আমাদের পাশের দেশ ইন্ডিয়াতে বহুসংখ্যক অকুপেশনাল থেরাপি ইউনিট আছে। আমি দক্ষিণ ভারতের একটি অকুপেশনাল থেরাপি ইউনিট দেখেছি। আমাদের দেশেও এই চিকিৎসা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। এগুলো হলে রোগীদের জীবনের গুণগত মানে পরিবর্তনত আসতো।

অনেক রোগী আছেন যারা চিকিৎসা নিয়ে বাসায় ফেরার পর আর ফলোআপে আসেনা। কেমন আছে তারা? তারা কি ঔষধ খাচ্ছে? তাদের পরিবারের পরিবেশটাই বা কেমন? তাদের সামাজিক জীবনটা কি ঠিক আছে? না তারা গুটিয়ে দিন কাটাচ্ছে। আটকে আছে নিজস্ব অদ্ভূত কল্পনার জগতে। দরজা-জানালা আটকে আঁধার ঘরে কাটাচ্ছে বছরের পর বছর। কে তাদের খবর নিবে? কে তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনের দাওয়াত দিবে? বিদেশে সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীরা এই কাজটি করে থাকেন। গত কয়েক বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ গবেষণা ইনস্টিটিউটের আওতায় ক্লিনিক্যাল সোস্যাল ওয়ার্ক নামে একটি কোর্স পড়ানো হচ্ছে। হয়তো এই সমাজকর্মীরা একদিন রোগীদের দুঃখ ঘোঁচাবে।

অনেক মানসিক রোগী আছেন যারা বড় মানসিক হাসপাতাল বা মেডিকেল কলেজ থেকে দূরে বসবাস করে। তাদের পক্ষে এত দূর থেকে এসে নিয়মিত চিকিৎসা নেয়া সম্ভব না। এজন্য উন্নত বিশ্বে

প্রাইমারি হেলথ কেয়ার পর্যায়েই তাদের চিকিৎসা সেবা দেয় হয়। দেন সাধারণ এমবিবিএস ডাক্তারেরা। অনেক দেশে প্রশিক্ষিত নার্সরা পর্যন্ত সিজোফ্রেনিক রোগীদের ঔষধের ফলোআপ করেন। জটিল কেসগুলো তারা ডাক্তারের কাছে পাঠান। সেগুলো আবার লক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করে নার্সদের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। শুনলে অবাক লাগে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তাদের দেশেতো ডাক্তার আছে প্রচুর। তবুও তারা মানসিক রোগের ডাক্তার দিয়ে সব রোগীকে সেবা দিতে পারেনা। আমাদের দেশের অবস্থা আরো খারাপ। দেশে মানসিক রোগের ডাক্তর মোটে ১১৫ জন। মানুষ ষোল কোটী। কি একটা অবস্থা! বিদেশী মডেল অনুসরণ করে বাংলাদেশ সরকার কাজ করছে। কাজ চলছে প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের সাথে মানসিক রোগের চিকিৎসা ইন্টিগ্রেটেড করার। হেলথ কমপ্লেক্সের এমবিবিএস ডাক্তারেরাই সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসা দিবেন। তাদের এত দূর এসে চিকিৎসা নিতে হবেনা। সরকারের এসেন্সিয়াল ড্রাগ লিষ্টে অ্যান্টিসাইকোটিক ঔষধ সহ বেশ কয়েক ধরণের মানসিক রোগের ঔষধ অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এই প্রকিয়াটি বাস্তবায়িত হলে অনেক রোগী উপকার পাবে। চিকিৎসা বাদ দেয়ার প্রবণতা কমে যাবে অনেকটা। তবে মক্কা বহু দূর। এখনো এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত হতে অনেক সময় লাগবে। তবে আশার কথা কাজ চলছে। এক দিন না এক দিন হবেই।

উন্নতবিশ্বে সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসায় আর্ট থেরাপি ব্যবহৃত হচ্ছে। গবেষণার মাধ্যমে সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসায় এর সফলতা পাওয়া গেছে। আর্ট থেরাপির কৌশল হিসাবে ছবি আঁকা, গান ও ছন্দ এবং নৃত্যকে ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত আর্ট থেরাপির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই। আমার জানামতে প্রশিক্ষিত আর্ট থেরাপিষ্ট নেই একজনও।

উন্নতবিশ্বে সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসায় সাইকোলজিক্যাল থেরাপি বা সাইকোথেরাপির প্রয়োগ ব্যাপক। গবেষণায় দেখা গেছে যে, এক্ষেত্রে ‘কগনিটিভ বিহেভিয়র থেরাপি’ বিশেষ ফলপ্রসু বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই ধরণের চিকিৎসায় রোগীন ত্রুটিপূর্ণ চিন্তাগুলোকে অত্যন্ত পরোক্ষ ভাবে পরিবর্তন করে তার রোগের লক্ষণ গুলোকে কমানো হয়। এছাড়া আচরণের মধ্যেও ইতিবাচক পরিবর্তন আনা হয়। ফলে রোগী তার রোগ থাকা সত্বেও জীবন-পথে দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে যায়। তার জীবনের গুণগত মানে উন্নতি ঘটে। তার ডিজঅ্যাবিলিটি বা পরনির্ভরশীলতা কমে অনকখানি। বাংলাদেশে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্টরা ‘কগনিটিভ বিহেভিয়র থেরাপি বা সিবিটি’ দিয়ে থাকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি পড়ানো হয়। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত মাত্র তেতাল্লিশ জন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট তৈরী হয়েছে। এদের একটি অংশ আবার দেশের বাইরে চলে গেছে। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্টরা অনক ধরণের সাইকোথেরাপি দিয়ে থাকেন।

কথায় বলে- ‘পাগলে কি না বলে’। তাই সিজোফ্রেনিক রোগীও যে মানুষ- তা আমরা ভুলে যাই। তার মনে কথার পাহাড়। কত অদ্ভূত কথা মনে ঘুরে বেড়ায়। কেউ শুনেনা। কত প্রশ্ন মনের মধ্যে।

কে দেবে উত্তর। ঔষধের পাশাপাশি এই রোগীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা দরকার। একে বলে সাপোর্টিভ কাউন্সেলিং। মাসে দুই - একবার অন্ততঃ এক ঘন্টার জন্য বসা দরকার।

সিজোফ্রেনিক রোগীদের সবার সমান অবস্থা হয়না। অনেকের সাথে কথা বলা চলে। তাদেরকে তাদের মতো করে সহজ ভাষায় তাদের রোগটি কি, এর চিকিৎসাই বা কি তা ভাল করে বোঝানো দরকার। একে বলে সাইকোএডুকেশন। রোগীর পরিবারের সদস্যদেরকে বিশেষভাবে রোগীর মূল যত্নগ্রহণকারী সদস্যদেরকে রোগটি কি, লক্ষণ কি, অতিরিক্ত রাগ হলে কি করতে হবে, ঔষধ কেন দেয়া দরকার, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কি, কিভাবে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, কি ধরণের পারিবারিক পরিবেশ রোগীর জন্য ভাল, রোগীর সামাজিক জীবন কিভাবে বাড়াতে হবে, তার যত্নগ্রহণ করতে হবে কিভাবে, কিভাবে তাকে স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে হবে, তার পেশাগত কাজে কিভাবে তাকে যুক্ত করা যায়, রোগটি বংশে ছড়ায় কিনা, রোগীর বিবাহ দেয়া দরকার কিনা, দিতে হলে কি কি সতর্কতা প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত বুঝিয়ে বলা হয় সাইকোএডুকেশনে। বাংলাদেশে ব্যক্তিগত পর্যায়ে, অর্থাৎ একজন অভিভাবকের সাথে একজন সাইকোলজিষ্ট বসে সাইকোএডুকেশন দিয়ে এর অনেকগুলো ভাল ফল পাওয়া গিয়েছিল। এতে রোগীর পরিবারের সদস্যদের মানসিক চাপ কমেছিল, তাদের সিজোফ্রেনিয়া বিষয়ক জ্ঞান বেড়েছিল এবং পুরো বিষয়টি রোগীর যত্নগ্রহণে ভাল প্রভাব ফেলেছিল। পৃথিবীর অনেক দেশে রোগীর পরিবারের সদস্যদের গ্রুপে সাইকোএডুকেশন দেয়া হয়। আমার কর্মস্থল জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে ভর্তি সিজোফ্রেনিক রোগীদের মূল যত্নগ্রহণকারীদের আমরা রোগী ভর্তিকালীন সময়ে সপ্তাহে একটি করে মাসে তিনটি সাইকোএডুকেশন দিয়ে ভাল ফল পেয়েছি। তবে এটি গবেষণা ছিলনা। রোগীর অভিভাবকেরা বাচনিক ভাবে তাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। আমার বিবেচনা মতে এতে পরিবারের সদস্যদের জ্ঞান বেড়েছিল, তাদের মানসিক চাপ কমেছিল, এবং তারা রোগীর যত্নগ্রহণে আরো পারদর্শী হয়ে উঠেছিল যা রোগীদের পুনঃপুনঃ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হবার প্রবণতা কমাতে সাহায্য করবে বলে আশা করছি।

সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের আত্মীয় পরিজনদের অবস্থা বড়ই মর্মান্তিক। কোন কোন রোগীর নিবীড় পরিচর্যা লাগে। কারো কারো রাগ বেশী। মেয়ে সিজোফ্রেনিয়া রোগী হলে আরো আতঙ্ক। এই রোগীরা অনেকে লক্ষ্য না করলে একদিকে হাঁটা দেয়। কোথায় যাচ্ছে তা বলতেও পারেনা। অনেকে নিজের নাম, বাবা-মার নাম, ঠিকানা কিছুই বলতে পারেনা। কাজেই মেয়ে রোগী যাতে কোন বিপদে না পড়ে তার জন্য পরিবার-পরিজন তটস্থ থাকে। বেশ কিছু গবেষণায় রোগীর যত্নগ্রহণকারীদের মনের চাপ অনেক বেশী বলে পাওয়া গেছে। আমার নিজের একটি গবেষণায় এই প্রাথমিক যত্নগ্রহণকারীদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের উপরের মানসিক চাপ এত বেশী পাওয়া গিয়েছিল যে, তা মানসিক রোগীদের সমতূল্য। বাংলাদেশে এই পরিবার-পরিজন, যারা চব্বিশ ঘন্টা একটা অদ্ভূত চাপপূর্ণ পরিবেশে সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের সেবা করছে তাদের চিকিৎসা বা মানসিক সমর্থন দেয়ার মতো ব্যবস্থা গড়ে

উঠেনি। যে নিজেই পাগল হবার মতো অবস্থায় আছে, সে রোগীর সেবাও ভাল ভাবে বরতে পারবেনা। এবিষয়ে উদ্যোগী হওয়া বিশেষ জরুরী। যতদিন কোন ভাল ব্যবস্থা গড়ে না উঠছে ততদিন পরিবারের তরফ থেকেই কিছু উদ্যোগ নিতে হবে। নিয়ম হলো সিজোফ্রেনিয়ার পরিচর্যাকারী যাতে সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন এই দায়ীত্ব থেকে অব্যাহতি পায় এবং প্রতিদিনও তার যাতে পর্যাপ্ত বিশ্রাম পায় তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। রোগীর চিকিৎসা ভাল ভাবে করতে হবে। তাহলে সে যত্নগ্রহণকারীকে ততটা জ্বালাবেনা।

উন্নত বিশ্বে সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের চিকিৎসার জন্য 'হেলিউসিনেশন গ্রুপ বা গায়েবী আওয়াজ গ্রুপ' পরিচালনা করা হয়। যে সিজোফ্রেনিক রোগীদের 'হেলিউসিনেশন' বিশেষতঃ 'অডিটরি হেলিউসিনেশন' হয় তারা একটি ছোট দলে বসে একজন থেরাপিষ্ট/ সাইকোলজিষ্টের তত্বাবধানে কেন তারা এভাবে কানে ভুল শুনছেন, কেউ শুনছেনা, অথচ তারা কেন শুনছেন তার একটা ব্যাখ্যা খুজতে চেষ্টা করেন। তারা এই 'গায়েবী আওয়াজের' সাথে খাপ খাইয়ে চলতে শিখেন। রোগীরা সাধারণতঃ গায়েবী আওয়াজের স্বাপেক্ষে একধরণের প্রতিক্রিয়া করতে থাকেন। ফলে মানুষ দেখে তারা বিড় বিড় করে কার সাথে যেন কথা বলছেন। মানুষ বুঝে যে এই লোকটি একজন মানসিক রোগী। যদি রোগী এটা বন্ধ করতে পারে, যদি গায়েবী আওয়াজের কথাগুলোকে তারা পাত্তা না দেয় তবে তারা জীবনে আরো ভাল ভাবে খাপ খাইয়ে চলতে পারবেন। এই রোগীরা নিবীড় ভাবে রিল্যাক্সেশন ব্যায়াম শিখেন। রিল্যাক্সেশন পেশীর ব্যায়ামের সাহায্যে, কল্পনার সাহায্যে ও নিয়ন্ত্রিত শ্বাস-প্রশ্বাস চর্চার সাহায্যে করা যায়। সিজোফ্রেনিয়ার রোগীরা অত্যন্ত খারাপ ভাবে উৎকণ্ঠায় ভুগে থাকেন। গভীর ভাবে রিল্যাক্সেশন করাতে পারলে তারা কিছুটা শান্তি পায়। রোগীরা তাদের নিজেদের দুঃখের কথা বলে ও একে অপরকে মানসিক সমর্থন জুগিয়ে মনে একধরণের শান্তি পান। তারা গায়েবী আওয়াজকে সহজভাবে নেন, কানে হেডফোন লাগিয়ে গান শুনে বা মানুষের সাথে গল্প করে তাদের গায়েবী আওয়াজ নিয়ন্ত্রণ করেন। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের ভর্তি সিজোফ্রেনিক রোগীদের নিয়ে আমরা কয়েক মাস ধরে এধরণের গ্রুপ পরিচালনা করার চেষ্টা করেছিলাম। ফল ততটা সুখকর হয়নি। রোগীরা এত বেশী মানসিক চাপ ও কষ্টে থাকে, এত অস্থির ও অমনোযোগী থাকে যে তাদের রিল্যাক্সেশন করাতে বা গ্রুপে কথা বলাতে প্রায় রোগী প্রতি একজন করে সাইকোলজিষ্ট বা ডাক্তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই গ্রুপ গুলো আমরা করতেও পেরেছি স্বল্প সময়ের জন্য। একঘনন্টা বসিয়ে রাখা ছিল দুঃস্বাধ্য। গ্রুপগুলো সপ্তাহে একবার করে ত্রিশ মিনিটের জন্য করা গেছে। ভর্তি রোগী হওয়ায় ওয়ার্ডের মধ্যে গ্রুপ পরিচালনা করতে গিয়ে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। অন্যান্য ভর্তি রোগীরা ভীর করে দাঁড়িয়ে গ্রুপের পরিবেশ বিঘ্নিত করতো। গ্রুপের জন্য আমাদের রোগী বাছাইতেও কিছুটা সমস্যা ছিল। আরেকটু কম লক্ষণযুক্ত রোগী নিলেই বোধ হয় ভাল হতো। যাহোক, যতটুকু করা গেছে তাতেও কিন্তু রোগীরা কিছুটা উপকৃত হয়েছে। সারাদিনে এই দুঃখী মানুষগুলো ওয়ার্ডে বসে থাকে। করার নেই কিছু। গ্রুপে থাকাকালে তবুও একটু পরিবর্তন হয়

পরিবেশের। তাছাড়া রিল্যাক্সেশন ও আবেগের প্রকাশ ও গায়েবী আওয়াজের সাথে খাপ খাওয়াতে শিখানোর মাধ্যমে রোগীর বেশ কিছুটা উপকারও হয়েছিল। এই ধরণের দল পরিচালনা ছিল নতুন অভিজ্ঞতা। বাংলাদেশে সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের জন্য এমন ধরণের চিকিৎসা সুযোগ গুলোর ব্যবস্থা করা বিশেষ ভাবে দরকার।

সিজোফ্রেনিয়ার রোগীরা সামাজিক দক্ষতা ভুলে যায়। যেসব রোগী চিকিৎসায় কিছুটা উন্নত হয়েছে তাদেরকে দলীয় পরিবেশে সামাজিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার। ফলে তারা সমাজে ফলপ্রসুভাবে মিশতে পারবে। বাংলাদেশে আমরা মানসিক রোগীদের সামাজিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ দিয়েছে। দলে এটি দেয়া হয়। একটি প্রশিক্ষণ মডিউল অনুসরণ করে মোটামুটি বারো থেকে পনেরো সপ্তাহে এটি দেয়া হয়। সপ্তাহে একটি করে প্রশিক্ষণ গ্রুপ করা হয়- দুই ঘন্টা করে গ্রুপ চালাতে হয়। সামাজিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ গ্রুপে তিনজন মনোবিজ্ঞানী থাকা দরকার। তাদেরকে অভিনয়েও কিছুটা দক্ষতা হতে হয় যাতে তারা রোল প্লে করে করে শেখাতে পারে। এধরণের গ্রুপ জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের ডা. নাসিরুল্লাহ্ সাইকোথেরাপি ইউনিট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি ও আরো কয়েকটি জায়গায় করা হয়েছে। তবে অংশগ্রহণকারীরা কেউ সিজোফ্রেনিক ছিলনা, ছিল সোস্যাল ফোবিয়া বা সামাজ ভীতির রোগী। তবে একই ধরণের মডিউলে সামান্য পরিবর্তন এনে সিজোফ্রেনিক রোগীদের সামাজিক দক্ষতা প্রশিক্ষণ গ্রুপ পরিচালনা করা সম্ভব। বর্তমানে দেশের ভিতর সিজোফ্রেনিক রোগীদের সামাজিক দক্ষতা প্রশিক্ষণের জন্য কোন গ্রুপ পরিচালিত হচ্ছেনা।

সিজোফ্রেনিক রোগীদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাইকোথেরাপি দেয়া যায়। এভাবে সাইকোএডুকেশন, রিল্যাক্সেশন, সাপোর্টিভ সাইকোথেরাপি ও কগনিটিভ বিহেভিয়র থেরাপি দেয়া যায়। উন্নত বিশ্বে বিশেষ ভাবে দক্ষ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্টরা এধরণের সেবা দিয়ে থাকেন। মনে রাখা প্রয়োজন, এধরণের সাইকোলজিক্যাল সেবা রোগীদের পরিপূর্ণ ভাবে সুস্থ করে তোলেনা। বরং এগুলো রোগীর ঔষধ গ্রহণ করার বিষয়টি নিয়মিত করে, তার লক্ষণ কমায়, জীবনের গুণগত মানে উন্নয়ণ ঘটায় ও তার ডিজঅ্যাবিলিটি কমিয়ে তাকে বেশ স্বনির্ভর করে তোলে। আমার কর্মস্থল জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে আমি ও আমার সহকর্মীরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে সিজোফ্রেনিক রোগীদের সাইকোথেরাপি দিয়েছি। ফলে রোগীও তার পরিবারের সদস্যরা ভাল বোধ করেছেন। রোগীর জীবনের গুণগত মান বেড়েছে। কোন কোন রোগী পেশায় যুক্ত হতে উৎসাহিত হয়েছে। বিবাহ করার ক্ষেত্রেও রোগীরা ও তার পরিবার সতর্ক হতে পেরেছে। তবে সাইকোথেরাপিতে সিজোফ্রেনিয়া ভাল হয়নি, ভাল হওয়ার লক্ষ্যও ছিলনা। তবে তারা উপকার পেয়েছে। তবে সব ঘটনা একরকম যায়নি। রোগীর বাছাইয়ে অসতর্কতা ও সাইকোথেরাপি দেবার সময় কিছুটা অদক্ষতার কারণে অন্ততঃ একবার আমাকে শক্ত পিটুনি খেতে হয়েছিল। ফলে আমি আরো সাবধান হতে পেরেছি। দেশে ব্যাপক সংখ্যক

সিজোফ্রেনিক রোগীদের তুলনায় আমাদের সেবার পরিমাণ একদম শূন্যের কোঠায়। রোগীদের স্বার্থেই তাদের মনোবৈজ্ঞানিক সেবা দেয়ার ব্যবস্থা করা দরকার।

সিজোফ্রেনিয়ার রোগীর পরিবারের পরিবেশ অনেক সময় ভাল থাকেনা। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অতিরিক্ত সমালোচনার চালাচালি হয়। তারা একে অপরকে ক্ষমা করতে পারেনা। মানসিক সমর্থন দেবার বদলে চলে সমালোচনা। খুব বেশী রাগারাগি হয়। সদস্যদের আবেগের আতিশয্য থাকে। তারা দীর্ঘক্ষণ একসাথে থাকে, আর একে অপরের পিছেই লেগে থাকে। এই পরিবেশকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'হাই এক্সপ্রেস্ড্ ইমোশন পরিবার'। হাই এক্সপ্রেস্ড্ ইমোশন বা আবেগের এই আতিশয্যের কারণে একবার সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণ কমলেও আবার বেড়ে যায়। আর যদি কারো একবার লক্ষণ বাড়া থাকে তবে এই ধরণের পরিবেশের কারণে লক্ষণ সহজে কমেনা। বিশেষজ্ঞরা ফ্যামিলি থেরাপি দিয়ে এই ধরণের হাই এক্সপ্রেস্ড্ ইমোশন কমানোর ব্যবস্থা করেন। এই প্রক্রিয়ায় পরিবারের সকল সদস্যদের ডেকে তাদের নিয়ে বৈঠক করে কি করা যায় তা ঠিক করা হয়। তাদের মধ্যকার পারস্পরিক যোগাযোগ বা কমিউনিকেশন উন্নত করার জন্য বিভিন্নমূখী পদক্ষেপ নেয়া হয়। সাধারণতঃ দুই ঘন্টা করে প্রতি পনের দিনে একটি করে ফ্যামিলি থেরাপি দেয়া হয। বাংলাদেশে খুবই স্বল্প পরিসওে (প্রায় নেই বললেই চলে) ফ্যামিলি থেরপি দেয়া হচ্ছে। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে সিজোফ্রেনিক রোগীদের পরিবারের সদস্যদের ডেকে স্বল্প পরিসরে ফ্যামিলি থেরাপি দিয়ে আমরা ভাল ফল পেয়েছি। এধরণের থেরাপি হাই এক্সপ্রেস্ড্ ইমোশন কমাতে বিশেস ফলপ্রসু। ফ্যামিলি থেরাপির সেবা আরো অনেক বাড়ানো প্রয়োজন।

সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসার সফলতা কিন্তু সামাজিক মনোভাবের উপরও নির্ভর করে। আমরা যদি মানসিক রোগ নিয়ে লজ্জিত থাকি, রোগীদেরকে বিরক্ত করে একধরণের দূষিত আনন্দ পাই তবে চিকিৎসার সফলতা কমে যেতে পারে। ধরুণ রোগীর চিকিৎসা খুব ভাল ভাবে দেওয়া হলো। কিন্তু সে যখন কোন কাজে বাইরে গেল তখন লোকে তাকে পাগল বলে খেপালো। তাদের বাড়িকে লোকে পাগলের বাড়ি বললো। মানুষ এই রোগীর পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে অস্বীকার করলো। এই পরিবারটিতে নিজেদের সন্তানদের খেলতে দিলনা। ফলে পরিবারটি সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। সহজেই অনুমান করা যায়, এই বিচ্ছিন্নতা সিজোফ্রেনিক রোগীর মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এই মনোভাব পরিবর্তন করা বিশেষ প্রয়োজন। এজন্য সমাজের সচেতনতা তৈরীর জন্য নানা ধরণের সামাজিক সংগঠন কাজ করা দরকার। এজন্য রোগীদেও আত্মীয় পরিজনদের নিয়ে গঠিত প্যারেন্টস অরগানাইজেশন বিশেষ ভাবে সহায়ক হয়। আমাদের দেশে এধরণের সংগঠনের বিশেষ ঘাটতি আছে। আমারর জানামতে একটি মাত্র প্যারেন্টস অরগানাইজেশন আছে- 'ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ফর মেন্টাল হেলথ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন'। এর অবস্থাও নিতান্ত নাজেহাল। এদেশের সিজোফ্রেনিক রোগীর পরিবারেরা একসাথে মিলে সংগঠন করতে মনে হচ্ছে আগ্রহী না।

আমার সন্তানের সিজোফ্রেনিয়া আছে এটা মানাই একটি বিরাট সাহসের কাজ। বলার কথা আরো পরে। সংগঠিত হয়ে সমিতি করাতো আরো সাহসের কাজ।

সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসায় উন্নতি করতে হলে এই রোগীদেও মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি করা দরকার। বর্তমানে রোগীদের অধিকারের কথাই মানুষ বুঝেনা। মনোভাব অনেকটা এমন- 'পাগলের আবার কি অধিকার'। মানুষ মনে করে ধরে মার লাগালেই রোগী ভাল হয়ে যাবে। যে কাউকে ধরে একবার মানসিক হাসপাতালে দিতে পারলেই হয়-বোঝা গেল এটা একটা পাগল। 'কে বললো পাগল। আমি বললাম পাগল। পাগল না হলে কি পাগলের ঔষধ খায়?' যেমন ধারা মানুষ, তেমনি তার যুক্তি বোধ! পরিস্থিতি পরিবর্তন করার জন্য 'মানসিক স্বাস্থ্য আইন ২০১৪' প্রণয়ণের জন্য। যদি আইনটির চূড়ান্ত সংস্করণে মানবাধিকার রক্ষিত হয় তবে আশা করা যায় দেশের সিজোফ্রেনিক রোগীদেও মানবাধিকার পরিস্থিতির তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি হবে। তবে সব কিছু এতো সহজে হবার নয়। বছরখানেক আগে একজন অবসর প্রাপ্ত সাইকিয়াট্রিষ্ট বলেছিলেন যে, উনি যখন চাকুরীর প্রথম পর্যায়ে তখনো এই তৈরীর কাজ চলছিল। তিনি এখন অবসরে। এটা কম কথা নয়। আইনটি নিশ্চয় সাংঘাতিক মানসম্মতভাবে তৈরী হচ্ছে তাই একটু সময় লাগছে। দেখা যাক এর শেষ কোথায় হয়।

সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের সেবা দেয়া এক কঠিন কাজ। এজন্য পরিবারগুলো খুব চাপের মুখে থাকে। উন্নত বিশ্বে দিনের বেলার সময়টা এই রোগীরা 'ডে কেয়ার সেন্টারে' থাকে। ডে কেয়ার সেন্টারে তার নানা ধরণের সেল্ফ কেয়ার স্কিল বা স্বনির্ভরতার দক্ষতা শিখে, চিত্তবিনোদন করে ও বিশ্রাম নেয়। তারা কিছু পেশাগত কাজও শিখে। দিন শেষে রোগী তার পরিবারে ফেরত যায়। ফলে রোগী উপকৃত হবার পাশাপাশি তার পরিবারও কিছুটা হাপ ছেড়ে বাঁচে। বাংলাদেশে কোন ডে কেয়ার সেন্টার নেই। আমি ইংল্যান্ডে কয়েকটি ডে কেয়ার সেন্টার দেখেছিলাম। বাংলাদেশেও এগুলো হলে রোগীরা বিশেষ ভাবে উপকৃত হত।

সিজোফ্রেনিয়ার কারণ সম্পর্কে নানা রকম মত প্রচলিত। এই রোগের কারণের বিষয়ে এখনো পরিষ্কার করে জানা যায়নি। কেউ বলছে এটি মস্তিস্কের নিউরোকেমিক্যালের গন্ডগোল থেকে হয়। আবার কেউ বিভিন্ন সামাজিক কারণকে দুষছে। এমনকি কেউ কেউ এতটাও বলছেন যে, সিজোফ্রেনিয়া একটি রোগ নয়, বরং অনেকগুলো রোগকে আমরা একটি রোগ মনে করছি। নানা বিতর্ক চলছে। তবে এপর্যন্ত বিশেষজ্ঞরা একটি বিষয়ে খুবই পরিষ্কার হয়েছেন যে, এই রোগের চিকিৎসা শুধু মাত্র ঔষধ দিয়ে হবেনা। মানসিক রোগের ডাক্তারের পাশাপাশি সাইকোলজিষ্ট, অকুপেশনাল থেরাপিষ্ট, সোস্যাল ওয়ার্ক সবারই একটা ভূমিকা আছে। এছাড়া চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতেও। বাংলাদেশ ক্রমাণ্বয়ে মধ্য আয়ের দেশ হয়ে উঠার প্রক্রিয়ার মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। ভালটাই আশা করা যাক। আশা করা যাক, দেশের সিজোফ্রেনিয়ার রোগী ও অন্যান্য মানসিক রোগীদের জন্য বিভিন্ন পেশাজীবীদের সমণ্বয়ে মানসিক স্বাস্থ্য টিম করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে।

আমরা মেডিকেল মডেল থেকে বের হয়ে বায়োসাইকোসোস্যাল মডেলে কাজ করবো সেই প্রত্যাশা হোক সবার। সিজোফ্রেনিয়ার রোগীর চিকিৎসা সফল হতে হলে এই রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে রোগটিকে সনাক্ত করে চিকৎসা দিতে হবে। এছাড়া সামাজিক মনোভাব পরিবর্তিত হতে হবে। রোগীদের মানবাধিকারও নিশ্চিত করতে হবে।

নোটঃ বর্তমান লেখাটি 'মনভুবন' পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যায় নভেম্বর ২০১৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে। লেখক **মোঃ জহির উদ্দিন** একজন ক্লিন্যিাল সাইকোলজিষ্ট। তিনি ঢাকার জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে এসিসটেন্ট প্রফেসর অব ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি পদে কর্মরত আছেন। এই লিখাটির বিষয়ে কোন মন্তব্য থাকলে লেখকের সাথে - zahirm_bd@yahoo.com এই ই-মেইলে যোগাযোগ করুন।